তবুও ভালোবাসা

রুনা তাসমিনা

উলুধ্বনির সুরে তখনো আচ্ছন্ন করুণা রাণী। কনে বিদায়ের লগ্ন। চোখের দুপাশ দিয়ে অনর্গল ধারায় জল নেমে এসে ভিজছে বালিশ। ঠিক তখনই কলিংবেলটা টুং-টাং করে উঠলো। প্রচণ্ড বিরক্তিতে কুঁচকে গেলো ভ্রু জোড়া। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো।

-লাবণ্য তুই! এই সাতসকালে! সব ঠিক আছে তো ?

স-ব ঠিক আছে মা। রাহুল মালয়েশিয়া যাচ্ছে। তাকে এয়ারপোর্টে এগিয়ে দিয়ে ভাবলাম তোমাদের দেখে যাই। তাই চলে এলাম। কিন্তু তুমি কেন কাঁদছ? কী হয়েছে?

-শরৎ বাবু যে তোর মা'কে কতবার কাঁদিয়েছেন, দেখলে নিশ্চয় তোর মাকে নিয়েই একটি উপন্যাস লিখতেন। কাল থেকে আবার দেবদাস ধরেছে। শেষ হওয়া পর্যন্ত আরো অনেকবার কাঁদবে। তুই ভেতরে আয় মা। হাতের পত্রিকাটি একপাশে রেখে হাসতে হাসতে বললেন অবনী বাবু।

দেবদাসটা এমন করলে কেন? ওই যে পোড়ামুখী চন্দ্রমুখী? ছেলেটার মাথাই খারাপ করে দিল। একসঙ্গে দু'জনকে কখনো ভালোবাসা যায়? চুনিলাল যদি দেবাকে চন্দ্রমুখীর কাছে না নিয়ে যেতো, পার্বতীর কাছে ঠিকই ফিরে আসতো। বাছা আমার, কতো কষ্ট নিয়ে জমিদার বাড়ির বউ হতে চললো। করুণা রাণীর চোখ আবার ভিজে উঠলো।

-আহা কী সৌভাগ্য পার্বতীর! দু দুটো মা পেয়েছে। আচ্ছা মা,আমার জন্যে কখনো কেঁদেছ অমন করে? হাসতে হাসতে মাকে জড়িয়ে ধরে বললো লাবণ্য। শাড়ির আঁচলে মুছে দিলো মায়ের ভেজা চোখ।

-বালাই ষাট। এমন অলক্ষুণে কথা মুখেও আনবিনা। তোর জন্যে কেন কাঁদবো? সাক্ষাত রাম আমার জামাই। মা লক্ষীর আশীর্বাদ তোদের ঘর জুড়ে থাকুক। হতোভাগি পার্বতী। মেয়েটার জন্যে বড়ো মায়া হয়। আবার গলা ধরে এলো করুণা রাণীর।

-মেয়েটাকে কিছু খেতে টেতে দেবে? নাকি আরো কাঁদবে দেবদাস পার্বতীর জন্যে?

করুণা রাণী শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে ধীর পায়ে চললো রসুইঘরে। বোঝাই যাচ্ছে দেবদাস থেকে এখনো বেরিয়ে আসেনি তার মন। লাবণ্য পত্রিকাটি টেনে নিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতে বললো,

-বাবা, চা খেয়ে একটু হাতিরঝিল যাবে? অনেকদিন যাই না। বাবা,

যাবে?

অবনী বাবু মেয়েকে বেশ ভালোই জানেন। কোনো কারণে লাবণ্যের মন আজ খুব অস্থির। ছোটোকাল থেকেই তার এই অভ্যাস। মন খারাপ হলেই বাইরে নিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হতো। ঐটুকুতেই মন ভালো হয়ে যেতো তার। লাবণ্য একেবারে উল্টো মায়ের। ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও বোঝার উপায় নেই। অবনী বাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন,

কী এমন হলো। করুণা রাণীকে চায়ের ট্রে হাতে আসতে দেখে কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে রইলেন তিনি। চা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালো লাবণ্য।

-বাবা, তুমি তৈরি হয়ে এসো।

-কোথায় যাচ্ছিস আবার? ফিরবি কবে?

-একটু কাজ আছে মা। বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি। ওদিক থেকে বাসায় চলে যাবো।

-সে কি! দুপুরে খেয়ে যাবিনা?

-মা,বলেছি তো। আরেকদিন।

ঢাকা শহর এখনো জেগে ওঠেনি পুরোপুরি। হাঁটতে বেরুনো লোকই বেশি রাস্তায়। লাবণ্যদের রিঙা চলছে। কুয়াশা-মাখানো বাতাস ঝাপটা দিচ্ছে মুখে। কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু,ছেড়ে যাইবা যদি-অবনী বাবু ইশারা করলেন মেয়েকে। লাবণ্যও মুগ্ধ রিঙাওয়ালার গানে। কী দরদ তার গলায়! লাবণ্যর ইচ্ছে করছে রিকশা সারাদিন তাকে নিয়ে ঘুরবে। আর এই গানটিই ঘুরে ফিরে শুনবে। রিকশাওয়ালার গানের সুর বাতাসের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে দূরে কোথাও। লাবণ্যের মনও হারিয়ে গেলো সেই সুরে।

-কই মা। নেমে আয়। বাবা ডাকছে। রিকশা থেমে আছে হাতিরঝিলের দুই নম্বর ব্রিজের কাছে। ব্রীজের উপর লোকজন বেশি। ওদিকে না গিয়ে ওরা ডানদিকে এগুলো। চুপচাপ হাঁটছে দুজন। অবনী বাবু জানেন সময় হলে লাবণ্য নিজেই বলবে যা বলার। তাই নিজে থেকে বলছেন না কিছু।

-একজন মানুষকে বুঝতে কতোদিন সময় লাগে বাবা? যদি সে খুব কাছের কেউ হয়?

-খুব কঠিন প্রশ্ন মা। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী। যাকে কোনদিনও বোঝা যায়-না। তুই কি এটা বলার জন্যেই বের হয়েছিস?

-না বাবা। বলছি সূর্যটা উঠতে না উঠতেই আবার ডুবে গেলো।

লেকের পানিতে কয়েকটি বোট পানি সরিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে লাবণ্য বললো,

-বাবা, কুয়াশায় ঢাকা সকাল কেমন মলিন লাগে। তাই না?। একটা নিঃশ্বাস নিয়ে যেনো নিজেকে প্রস্তুত করলো। অবনী বাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন লাবণ্যের পরের কথাগুলো শোনার। পানিগুলো নীরবে লেকের পাড় ছুঁয়ে যাচ্ছে আলতো শব্দে। ঠিক তেমন নিরব কিন্তু আলতো শব্দে লাবণ্য বললো, -বাবা, রাহুল আর ফিরবে না।

কাগজের বিদ্যা বনাম ই-বুক

আয়েশা পারভীন চৌধুরী

ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত খবরের কাগজ ও বইয়ের কোন বিকল্প নেই। অনেকেই আজকাল ঘরে সংবাদপত্র রাখতে আগ্রহী নয়। কয়েকটি টাকা বাঁচানোর জন্যে স্মার্টফোন নির্ভর হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটি ছাপা অক্ষরে সংবাদপত্র একটি পরিবারের সদস্যকে অনেক ভাবে প্রভাবিত করে। একটি সমাজ ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান জানাতে সাহায্য করে। একটি পরিবারের বাচ্চাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে। যে পরিবারে ছাপা অক্ষরের সংবাদপত্র আছে, সেই পরিবারের সদস্য প্রতিদিনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সহজেই জানতে পারে বলেই নিজেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তোলে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে উন্নত করতে দৈনন্দিন সংবাদপত্রের বিকল্প নেই বলেই বিসিএস ও অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের প্রতিদিনের সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া যে কোন মৌখিক পরীক্ষার কিছু কিছু প্রশ্ন শুধুমাত্র ছাপা অক্ষরের সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

এক সময় পরিবারের মর্যাদাও সংবাদপত্র নির্ভর ছিল, যাদের পরিবারে একটি সংবাদপত্র নেওয়া হত সেই পরিবারের সদস্যদেরকে সম্মানের সাথে বিবেচনা করা হত। এখনো আলোকিত পরিবারের পিছনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যারা চট্টগ্রাম নির্ভর সংবাদপত্র রাখেন তাদের কাছে এক নম্বর পত্রিকা হচ্ছে দৈনিক আজাদী। পরবর্তীতে দৈনিক পূর্বকোণ ও পূর্বদেশ, এরপর অন্যান্য পত্রিকার অবস্থান। আবার যারা ঢাকা কেন্দ্রিক জাতীয় পত্রিকা নেন তাদের একেকজনের কাছে একেক পত্রিকা প্রিয়। এভাবে ছাপা অক্ষরের সংবাদপত্র পারিবারিক মর্যাদার মাপকাঠিতে পরিণত হয়। ছাপা অক্ষরের গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতার বইগুলো মনের সৌন্দর্যের পাশাপাশি চারিত্রিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে। রুচি ও সংস্কৃতির দিকে তারা অনেক উন্নত হয়। তাই ছাপা অক্ষরের পড়া, কাগজের পড়া একজন সুন্দর মনের মানুষ হতে, আলোকিত মানুষ হতে ও স্বনির্ভর গৌরবময় মানুষ হতে সাহায্য করে।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রের পড়া ও জ্ঞান বেশিদিন স্থায়ী নয় বলেই সহজে ভুলে যায়। অন্যদিকে ছাপা অক্ষরের জ্ঞান অনেক অনেক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভাবা হয়েছিল, ই-বই জনপ্রিয় হতে থাকবে, আর কাগজে ছাপা বই যাবে উঠে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে যায়। বরং দিন দিন কাগজে ছাপা বইয়ের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলছে। গার্ডিয়ান ও ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের সূত্র মতে, পুস্তক প্রকাশে সংগঠনগুলোর হিসাবে ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যে ই-বইয়ের বিক্রি বেড়েছে ৮ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের এই অনুপাত ছিল ১ দশমিকে ৭ শতাংশ ও ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। কোয়ার্টজ ম্যাগাজিনে নাতাশা ফ্রস্ট লিখেছেন, ২০১৮ সালে আমেরিকা আর ইউরোপ দুই মহাদেশেই ছাপা বইয়ের বিক্রি বেড়েছে এবং ২০১৩ সালের পর কাগজে ছাপা বই বিক্রি করার দোকানের সংখ্যা বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। পশ্চিমে অনেক ছাপা সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এশিয়ায় বিক্রি বেড়েছে। আমাদের পাশের দেশ ভারতে স্থানীয় ভাষার পত্রিকাগুলোর বিক্রি বেড়ে চলেছে। যেখানে মোবাইল কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত বিভিন্ন লোভনীয় অফার দিয়ে যাচ্ছে সেইখানে ই-বুকের জায়গায় কাগজের বইয়ের কদর প্রশংসনীয়। বর্তমানে গুজবের মাধ্যমে আতঙ্ক ছড়ানোর বিষয়টি সবার নজর কেড়েছে। অধিকাংশ বড় বড় ঘটনার পিছনে গুজবকে দায়ি করা হয়। যতটুকু নয়, তার ছেয়েও অধিক হারে গুজবের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি ছেলে ধরা গুজবে সবাই খুব চিন্তিত আছে। বাচ্চাদের ঘর থেকে বের হতে দিতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। তাছাড়া নিজের বাচ্চাকে নিয়েও কেউ বের হতে সাহস পাচ্ছে না। হঠাৎ বাচ্চা কেঁদে উঠলে যদি জনগণের রোষানলে পড়ে, এই ভয়। রানু নামে একজন মহিলাকে পিঠিয়ে হত্যা করার ঘটনা সকলকে ব্যতিত করেছে।

পদ্মা সেতুতে মাথা লাগবে বলে গুজব ছড়ানোর ফলে চারিদিকে ছেলে ধরা সন্দেহে বেশ কয়েকজন গণ পিটুনিতে মারা যায়। তাছাড়া মানব সৃষ্ট কয়েকটি বড় বড় দুর্ঘটনার পিছনে গুজবকেই দায়ী করা হয়েছে। যে কয়েকটি বড় বড় আগুনের ঘটনা হয়েছে তাতে কারো না কারো হাত আছে বলে বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়। গুজব ছড়ানোর মাধ্যমে জন সমাগম ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কেউ কেউ ফায়দা লুটে নিচ্ছে। সরকারকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলছে। কেউ কেউ ধারণা করছে, সরকার পক্ষ নিজেই কোন কোন ক্ষেত্রে গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে অন্য কোন খাতে প্রবাহিত করছে। এই গুজবের পিছনেও স্মার্টফোনের ভূমিকা অনেক।

আমাদের বর্তমান প্রজন্ম দিন দিন যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানের বিস্ময় আবিষ্কার কম্পিউটারের ফলে আনন্দ-বিনোদন থেকে শুরু করে যোগাযোগ ও তত্ত্ব-তথ্য আদান-প্রদান অনেকাংশে সহজ হয়ে যায়। সব কিছু এত সহজলভ্য বলেই আধুনিক প্রজন্ম বার বার আধুনিক প্রযুক্তিকে বেছে নেয়। তাদের নিত্যদিনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে একটি স্মার্টফোনের ভূমিকা চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এই স্মার্টফোনের সঠিক ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আধিপত্য বিস্তার ও নিজের অবস্থান জানানোর জন্য অনেক ধরনের অপরাধ করে চলছে। বর্তমানে কিশোরদের একটি অংশ দলে দলে বিভক্ত হয়ে শহরের আনাচে-কানাচে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত হচ্ছে। কী আশ্চর্য। একটি সুন্দর শৈশবের পথ ধরে যে কিশোর বেড়ে উঠে তারা এখন কিশোর গ্যাংয়ের সাথে জড়িত হয়ে নানান অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে। কিশোর শব্দটার সাথে জড়িয়ে আছে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা-একটি জীবনের সব সুন্দর ও সুখময় অনুভূতিগুলো। অথচ আমরা এখন এমন সময় পাড় করছি যখন আমাদের সামনেই আমাদের আদরের কিশোর-কিশোরীরা অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের আদরের বাচ্চারা ঘর থেকে বের হয়ে কোথায় যায়, কার সাথে মিশে, কীভাবে সময় কাটায়, ইত্যাদি বিষয়গুলো এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তারা ঘরে বসেই স্মার্টফোনের সাহায্যে তাদের সঙ্গী-সাথীদের সাথে মতবিনিময় কালে কি করছে এই বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় যে সব কিশোর অপরাধের সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে স্মার্টফোনের বিষয়টি আগে আসে। কোন না কোনভাবে এই কিশোরদের ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া পাওয়াকে প্রভাবিত করে। যে কোন সাধারণ ঘটনা তারা যেমন সহজে জানতে পারে তেমনি যে কোন অপরাধ সংঘটিত করতেও তারা স্মার্টফোনের সাহায্য নেয়। এই ক্ষেত্রে সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিভাবকরাও অসহায় হয়ে পড়ে। কিশোর গ্যাং এর সাথে জড়িত এলাকা ভিত্তিক দলগুলোর একটি নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে। প্রতিটি মুহূর্তে তারা ইঙ্গিত করছে।

সহজেই যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নেয়। সম্প্রতি প্রতিটি টিভি চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকায় কিশোর গ্যাংয়ের উপর প্রচারিত সংবাদগুলো আমাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে, আবার মাঝে মাঝে টকশোগুলো কিশোর গ্যাং নিয়ে নানান আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে এই সমস্ত কিশোর গ্যাংয়ের নেপথ্যে যারা আছে তাদের মুখোশ খুলে দিচ্ছে। তবুও থামে না অন্যায়। দিন দিন একটি অপরাধ থেকে আরো একটি অপরাধের জন্ম হচ্ছে। আনিসুল হক অভিভাবকবৃন্দকে সচেতন হতে অনুরোধ করেন। আমাদের বাচ্চাদের মন-মানসিকতা তাদের নিজেদের পরিবার দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে অভিভাকদের নজরদারিতে, স্নেহ, আদর ও শাসনে কিশোর-কিশোরীদের সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করেন। আনিসুল হক আরো বলেন, সন্তানের হাতে যন্ত্র নয়, বই তোলে দিন। বাড়িতে পত্রিকা রাখুন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এত নেতিবাচক বিষয় প্রচারিত হয় যাতে শ্বাসরোধ হয়ে আসে। তিনি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ভাষায় অভিভাবকবৃন্দকে অনুরোধ জানান, চারপাশের দরজা-জানানোগুলো খুলে দিন, আমরা একটু বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিতে চাই। দৈনিক খবরের কাগজ আর বই হলো সেই জানালা। এই জানালার মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাদের সুন্দর ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত খবরের পিছনে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিভাবকের অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায়, কোন এক সময় তাঁর সন্তানকে কে যেন ফোন করে বাহিরে ডেকে নিয়ে যায়। যারা ফোন করে তারা নিশ্চয়ই পূর্ব পরিচিত। তাই প্রতি জন অভিভাবককেও সন্তানদের সঙ্গী-সাথী সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

একটি মূল্যবান প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে সর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' আসলেই সত্যি। প্রবাদটি পুরানো হলেও বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত সংবাদে এর সত্যতা জানা যায়। এমন দুর্ঘটনার পিছনে নিজের বন্ধু-বান্ধবীরাই জড়িত। এক একটি খুন, এক একটি অন্যায় বার বার আমাদের অসচেতনাতাকে দায়ি করছে। তাই যন্ত্র নয়, জ্ঞানের জানালা খুলতে বইয়ের বিকল্প নেই।

পুঁথি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ইসহাক চৌধুরী

নাসিরুদ্দিন চৌধুরী

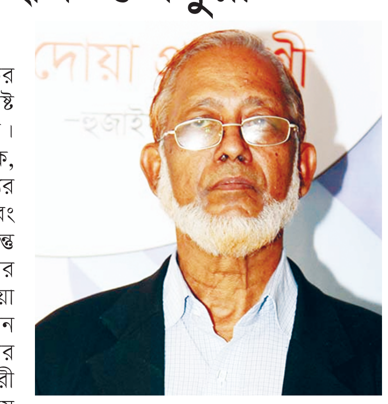

ইসহাক চৌধুরী বহুতর পরিচয়ে একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধিক পুরুষ ছিলেন। তাঁকে বলা যায় লেখক, গবেষক, পুঁথি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ এবং বিবলিওগ্রাফার। কিন্তু আমার বিবেচনায় তাঁর শ্রেয়তর পরিচয় হওয়া উচিত 'গবেষক'। এখন গবেষকের প্রাদুর্ভাবের কালে ইসহাক চৌধুরী নিশ্চয়ই ব্রাত্য হয়ে যাবেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র সেন, ক্ষিতি মোহন সেন, নীহার রঞ্জন রায়, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, শশাঙ্ক মোহন সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সুবোধকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ যখন বাংলা সাহিত্যে গবেষণার জন্য মান্য হতেন, তখন গবেষকের সত্যই আকাল ছিলো। আর এখন গবেষক হওয়া একটি সহজ কর্মে পরিণত হয়েছে।

যেসব মহাজনের নাম আমি উপরে উল্লেখ করলাম 'ওজু কালাম' পড়ে যাঁদের নাম নিতে হয়, তাঁদের সমপংক্তিতে ইসহাক চৌধুরীর নাম নেওয়া বেয়াদপিরই সামিল হয়, তাঁদের চরণসেবা করতে পারলেও ইসহাক চৌধুরী ধন্য হতেন। তবে গবেষকের মানদণ্ড অনেক নিচুতে নামিয়ে আনতে পারলে ইসহাক চৌধুরীকে একজন ছোটোখাটো গবেষক হয়তো বলা যায়। ইসহাক চৌধুরী যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণাকর্ম করেছেন, সেটা সাহিত্যের বাধা সড়ক নয়, তিনি সাহিত্যের একটি গলিপথ দিয়ে বিচরণ করেছেন, যেমন কৃষিজীবীকে গ্রামের আলপথ দিয়ে হাঁটতে হয়। পুঁথির খোঁজে ইসহাক চৌধুরীও সত্যিই আল দিয়ে হেঁটেছেন; দূর গাঁয়ের কোনো কৃষক হয়তো যক্ষের ধনের ন্যায় একটি পুঁথি আঁকড়ে ধরে বসে আছেন, সে খবর পেয়ে ইসহাক চৌধুরী বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে ধূলিধূসরিত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে পৌঁছে গেছেন সেই কৃষকের পর্ণকুটিরে গুটি গুটি পায়ে। তারপর কত কাকুতি মিনতি, হাতে পায়ে ধরে সেই পুঁথি হস্তগত করে পটিয়া থানার দক্ষিণ হুলাইনে তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন। সাহিত্যের যে দিকটায় ইসহাক চৌধুরী হাঁটাহাঁটি করেছেন, সেখানে প্রথম পদধূলি দেন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, দীনেশ চন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, স্যার যদুনাথ সরদার, রাখাল দাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর একে একে পায়ের ছাপ পড়ে নলিনী কান্ত ভট্টশালী, ড. আহমদ হাসান দানী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লা, আরসি মজুমদার, 'হারামণি'র লেখক অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার, ড. মোহর আলী, ড. আবদুল গফুর, ড. আবদুল করিম, আশুতোষ, চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, আবদুল হক চৌধুরীর।

ইসহাক চৌধুরীর পিতা আবদুস সাত্তার চৌধুরী ছিলেন শিক্ষক। পটিয়া থানার দক্ষিণ হুলাইন গ্রামে ছিলো তাঁর বাড়ি; সাহিত্যবিশারদের বাড়ি থেকে মাত্র মাইল তিনেক দূরত্ব। সাহিত্য বিশারদ একদিন তাঁকে ডেকে পুঁথি সংগ্রহের কাজ দেন। সেই যে পুঁথির প্রেমে পড়লেন তিনি, সারা জীবনেও আর তার মায়া কাটাতে পারলেন না। ছেলে অর্থাৎ ইসহাক যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হলো, তখন তাকেও পুঁথি সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করলেন। পুঁথির প্রেমে মজে কোথায় না গেছেন সাত্তার মাস্টার; সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা, যার মধ্যে বর্তমান কক্সবাজারও অন্তর্ভুক্ত ছিলো, সম্ভবত নোয়াখালী, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেটের দিকেও তিনি খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলেন। শুধু যে পুঁথি তার অনুসন্ধানের বিষয় ছিলো তা নয়, তিনি প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ, পাণ্ডুলিপি, পুস্তকও উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মুর্শিদ সাহিত্যবিশারদের প্রয়োজন মিটিয়েও তাঁর হাতে এত পুঁথি থেকে গেলে যে, সেগুলি তিনি বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। তারপরেও অন্তত হাজার দুয়েক পুঁথি তার হাতে উদ্বৃত্ত থেকে যায়। তিনি সেগুলি পুত্রকে দান করেন। অদ্ভুত উত্তরাধিকার ! ধন নয়, মান নয়, দিলেন কিছু পুঁথি আর পুঁথির প্রতি অজস্র ভালোবাসা। সাত্তার সাহেবকে সৈয়দ আলী আহসান সাহেব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দিয়েছিলেন, তিনি বসতেন লাইব্রেরিতে। বেশ কয়েকবার আমি সেখানে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমি অর্থাৎ তাঁর বন্ধু হুলাইনের আবদুস সালাম মাস্টারের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কবি নূর মুহম্মদ চৌধুরী সাহিত্যরত্নের পুত্র বাঙলা সাহিত্য পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে সেটা জেনে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

পিতার কাছে হাতেখড়ি হয়েছিলো পুঁথি পাঠে; পিতার দেহত্যাগের পর ইসহাক নিজেও পুঁথির জগতে ডুব দেন; তারপর কত যে মনি মুক্তা কুড়িয়ে তুললেন, যেগুলি তিনি সারস্বতজনের সেবায় দান করে যান। বাংলাদেশে এমন ক'টি পরিবার আছে আমি জানি না, যে পরিবারে পুরুষানুক্রমে পুঁথি সাহিত্যের চর্চা হয়েছে। কিন্তু আবদুস সাত্তার চৌধুরীর পরিবারে দুই পুরুষ ধরে পুথি সাহিত্যের চর্চা হতে আমরা দেখলাম। মৃত্যুতে তাঁর পুথি গবেষণা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তাঁর পিতার সংগৃহীত পুঁথি এবং তিনি নিজে যা সংগ্রহ করেছিলেন, সেসব সুবিন্যস্ত করে তিনি তাঁর পিতার নামে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশী-বিদেশি গবেষকের এক তীর্থস্থান হয়ে উঠুক আবদুস সাত্তার চৌধুরী পুঁথি সংগ্রহশালা।

ইসহাক যেক্ষেত্রে অনন্য, সেটা হলো পুঁথির পাঠোদ্ধার; বাংলাদেশে এখন মিউজিয়াম, আর্কাইভস্? এবং কিছু লাইব্রেরি হয়েছে। বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি তো রয়েছেই। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও লাইব্রেরি এবং মিউজিয়ামগুলি থেকে পুঁথি সাহিত্যের ওপর ক'জন বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে আমি জানি না।

এআই-পাড়ার সাহিত্য

মাহমুদ আলম সৈকত

গেলো মাসে ভারতের ওড়িশায় প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও পুনরুদ্ধার কেন্দ্র 'প্রাচীন' আয়োজিত একটি সাহিত্য সম্মেলনের ভিডিও দেখছিলাম। এবারের সম্মেলনে 'প্রাচীন' ঘোষিত 'সাহিত্য সম্মান' পদক পেলেন খ্যাতনামা গীতিকার ও লেখক জাভেদ আখতার। পদক গ্রহণের পর, শুভেচ্ছা বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলছিলেন, "আগামীতে কী হতে যাচ্ছে, সেটা আমি এখনই বলতে পারছি না। তবে এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিত যে এআই কোনোভাবেই মানুষের সৃজনশীলতাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নিজস্ব কোনো বিবেক নেই; এটি নির্ভর করে আপনি কীভাবে ব্যবহার করছেন তার ওপর। এআইএর ভেতরে থাকা উপাদানগুলো নিজে থেকে খারাপ নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবেন, মানুষ সব আবিষ্কারকেই প্রথমে ভয় পেতো, এমনকি বাষ্পীয় ইঞ্জিনকেও শয়তানের যান বলে অভিহিত করা হয়েছিল।" উনার এই বক্তব্য আমাকে আরেকটি ভাবনার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এমনিতে উপরের বক্তব্যটি এআইএর সঙ্গে বা এআইকে নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাদের সবার জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু সৃজনশীল অঙ্গনে? বিশেষ করে লেখকুশিল্পীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কীরকম হতে পারে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাড়বাড়ন্ত কী মানুষের সৃজনশীলতাকে সত্যিই ছাপিয়ে যেতে পারবে না বা ছাপিয়ে গেল একদিন! এপ্রসঙ্গে আরেকটু জানতে অন্তর্জালে বেশ কয়েকদিন নানান রকমের আর্টিকেল পড়া শুরু করলাম। আর এই পাঠের মধ্যে কে. এম. ওয়েইল্যান্ডের একটি প্রবন্ধ পড়ে চিত্তাকর্ষক মনে হলো। সেই প্রবন্ধেরই অনুবাদকৃত নির্বাচিত অংশ রইল এই লেখার বাকিটুকুতে।

আমরা এখনো কেবল সেই সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছি, যেখানে এআই সৃজনশীল সহিত্য রচনার জগতে নতুনভাবে যুক্ত হতে পারে। ইতিমধ্যেই বহু লেখক শিখণ প্রক্রিয়ায়, গবেষণায়, কাঠামো তৈরি করতে, প্লট দাঁড় করাতে, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে এআইএর সহায়তা নিচ্ছেন। সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় এআইএর সহায়ক ভূমিকা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত। যে মাত্রায় এআই আমাদের প্রকৃত অর্থে আরও সৃজনশীল করে তোলে (অধিক উৎপাদনশীল নয়), সে অর্থে এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ও বিস্তৃতিমুখী উপকরণ হয়ে উঠবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শিল্পীর উচিত সচেতনভাবে অনুধাবন করা যে, ঠিক কোথায় এসে এআই সৃষ্টির হাতিয়ার থেকে স্রষ্টায় পরিণত হয়।

যে ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগুচ্ছি, সেখানে মানুষ ও এআই ক্রমশ আরও বেশি সহযোগী হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতে আমি সবাইকে নিজের প্রতি একটি প্রশ্ন করতে আহ্বান জানাই, আমি কি এমনভাবে এআইএর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, যা আমাকে আরও মানবিক করে তুলছে, বা অমানবিক? শিল্পী, লেখক, সৃজনশীল মানুষদের জন্য এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আমাদের সৃষ্টিশীল কর্মই আমাদের মানবিকতার ভিত রচনা করে, প্রথমে ব্যক্তি হিসেবে, পরে সামষ্টিকভাবে।

এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূলত একটি "মানসিক" উপকরণ। এটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যেন সে এক চিন্তাশীল কিছু। ফলে মানসিক শ্রমের সব ধাপেই সহায়তাকারী হিসাবে এর ভূমিকা অনন্য। (হয়তো কোনো একদিন এটি স্বপ্ন দেখবে, অনুভূতিও করবে। কিন্তু তখনও প্রশ্ন থাকবে, আমরা কি চাই, সে আমাদের হয়ে স্বপ্ন দেখুক বা অনুভব করুক?)

কখনো কখনো, বিশেষ করে প্লট বা ঘটনা ভিত্তিক কিংবা বা আউটলাইনুপ্রধান লেখকদের

কাছে মনে হতে পারে গল্প লেখা একটি মানসিক প্রক্রিয়া। অথচ লেখালেখির মানসিক অংশটি গোটা অভিজ্ঞতার কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং প্রায়ই এটি সবচেয়ে শেষ দিকের স্তর। গল্প কেবল মানসিক খেলা নয়; এটি গভীরভাবে অনুভূত এক সৃজনপ্রক্রিয়া, শরীর ও মনের অভিজ্ঞতার সম্মিলন। এই কারণেই গল্প সৃষ্টিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে আমি সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখি।

আমরা যারা লেখালিখি করছি, তাদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের লক্ষ্য আসলে কী? হয়তো এটি আপনি উপভোগ করেন। হয়তো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনহেতু তাকে ব্যবহার করছেন। হয়তো গল্প সৃষ্টির জটিল পথটিকে সহজ করতে এটির ব্যবহারিক সুবিধা আপনাকে চমৎকৃত করে। হয়তো আরও প্রোডাক্টিভ বা উৎপাদনশীল হতে চান। এসবই বৈধ কারণ-, যতক্ষণ না এর ফলে সৃষ্টির গভীর অভিজ্ঞতা ব্যাহত হয় বা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে। গল্প প্রথমত আমাদের অবচেতন মনের সঙ্গে আলাপ; পরে তা বিস্তৃত সমষ্টিগত অবচেতন মন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গল্প আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বকে গড়ে তোলে। এটি শুধু যোগাযোগ নয় বরং এটি এক ধরনের পবিত্র সঙ্গ বা সংঘ, নিজের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে এবং সেই অসীম রহস্যের সঙ্গে, যা বোধগম্যের বাইরে।

সাহিত্য সৃষ্টি অবশ্যই পবিত্র কিছু। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা এআইকে সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না। বরং যতক্ষণ এআই আমাদের সৃজনশীল অবচেতন মনকে বিস্তৃত করে ততক্ষণ এটি সহায়কই হবে। কিন্তু গল্পের পবিত্রতা মানে হলো, এআইয়ের সহজ ও দ্রুত উত্তরের প্রলোভনে পড়ে যেন আমরা সৃষ্টির গভীর প্রক্রিয়া এড়িয়ে না যাই। আমার জন্য, গল্প বলা সবসময়ই স্বীয় গভীর অবচেতন, আমার স্বপ্নদর্শী সত্তার সঙ্গে আলাপচারিতা। এআই কী বানিয়ে দিয়েছে, তা জানতে আমি আগ্রহী নই; আমি আগ্রহী আমি কী লিখছি, আপনি কী লিখছেন সেটা জানতে। পাশাপাশি, যদিও এআই সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে, এটি আমাদের নিজস্ব ক্ষমতাকে হ্রাস করার ঝুঁকিও রাখে বৈকি। এআই কি কাউকে বই লিখতে শেখাতে পারে? গল্পের তত্ত্ব শিখাতে পারে? হ্যাঁ, পারে। কিন্তু কেবল সহায়ক হিসেবে।

কারণ গল্প কেবল একটি মানসিক ব্যায়াম নয়; এটি সম্পূর্ণ এক দেহধর্মী অভিজ্ঞতা। অনেক মহৎ লেখকই কোনো ফর্মুলা জানতেন না, গল্প তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেও পারতেন না, তবু তাঁরা এমন সব গভীর সৃষ্টিকর্ম রচনা করেছেন, যা মানবসমাজের অবচেতনকে স্পর্শ করেছে এবং রূপান্তরিত করেছে।

মোটাদাগে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্দেশ্যই হলো শর্টকাট দেওয়া। এতে ভালোমন্দ উভয় দিকই রয়েছে। যেমন অন্তর্জাল আমাদের মস্তিষ্ক তথা ভাবনার আঙ্গিককে বদলে দিয়েছে, তেমনি এআইও আমাদের চিন্তাভাবনার ধরন পাল্টে দেবে। আমরা যারা সৃষ্টিশীল, তারা সমাজের প্রাণশক্তি।

লেখকেরা সমাজের কণ্ঠস্বর। আমরা কীভাবে এআইকে ব্যবহার করে বাঁচব এবং সাহিত্য সৃষ্টি করব তার প্রভাব আমাদের নিজেদের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। এই পরিবর্তনের সময়ে আমরা প্রত্যেকেই ইতিহাসের একটি গভীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো চরিত্র। আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তই তাই গুরুত্বপূর্ণ। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণ এখানে কোনো একক "সঠিক" পথ নেই। সবচেয়ে জরুরি হলো, আমরা যেন মনে রাখি: আমরা আমাদের জীবনের রচয়িতা। আমাদের সিদ্ধান্তের দায় আমাদেরই।

একবার কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগে লেখক হওয়ার কোনো মূল্য আছে কি? এর উত্তরে আমি বলেছিলাম, এআই নিয়ে অতিরিক্ত হতাশা (বা অতিরিক্ত আশাবাদও) আমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। লেখকেরা সবসময়ই তাদের সাহিত্যকর্মের প্রকাশনা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, বই প্রকাশিত হোক বা না হোক, উভয়ই ভয়ংকর। আজকের দিনে এআইকে সহজেই আমাদের ভয় ও দ্বিধার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়, এবং তাতে করে আমরা ভাবার ফুরসত পাই যে, "সব শেষ, এসব করে কী লাভ?" এবং আমরা যে কাজে হাত দিতে ভয় পাচ্ছি, সেটি আর করা হয়ে ওঠে না। অনেক সময় নতুন প্রযুক্তিগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ভয়কে আড়াল করার "অপয়া ভূত" হিসাবে আবির্ভূত হয়। এখন, প্রশ্ন হচ্ছে, এআই কি গল্পকারদের বিলুপ্ত করে দেবে? কে জানে! তবে আমার ব্যক্তিগত মত, একদমই না। প্রযুক্তি গল্প বলার ধরন পাল্টাতে পারে, কিন্তু শিল্পের মূল গতিবিদ্যা পাল্টায় না। একজন মানুষ কিছু বলতে চায়, আর অন্য কোনো মানুষ তা অনুভব করতে চায় এই সারসত্য, মানবসৃষ্ট সৃষ্টিশীলতার প্রয়োজন কোনদিনই হারাবে না। ফলে সৃষ্টি অব্যাহত থাকুক। আমরা এখন এক বিশাল গল্পের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, আর এক্ষেত্র যেমনটি হওয়া দরকারও বৈকিুপথ চলায় ভয়ও আছে, উত্তেজনাও আছে।